Vol. 1 | No. 2 | 1957

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

বাঙলা সাহিত্যে উপাখ্যান : গুলে বকাওলী

Volume	1
Issue	2
Year	1957
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	আবু মহামেদ হাবিবুল্লাহ
Published online	December 16, 1957
DOI	10.62328/sp.v1i2.1
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v1i2.1
Pages	1-16
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা
প্রথম বর্ষ : দ্বিতীয় সংখ্যা
শীত, ১৩৬৪

বাঙলা সাহিত্যে উপাখ্যান : গুলে বকাওলী

আবু মহামেদ হাবিবুল্লাহ

(এক)

মধ্যযুগের বাঙলা সাহিত্যে উপাখ্যান ও রোমান্সের সূত্রপাত মুসলমানদের হাতেই হয়, এ নিয়ে এখন আর বোধহয় দ্বিমত নেই। হিন্দু-রচিত কাহিনীর সঙ্গে মুসলমান লেখকদের 'কিস্সা'র মৌলিক তফাৎ : দেবদেবীর মাহাত্ম্য বর্ণনা-প্রসঙ্গে মুকুন্দরাম বা ভারতচন্দ্র কাহিনীর অবতারণা করেছেন, শিল্পসৃষ্টি বা মনোরঞ্জনের জন্য নয়। ক্লাসিকাল সংস্কৃত সাহিত্যের বাসবদত্তা বা কাদম্বরীর মত বর্ণনা ও ঘটনামূলক প্রেমোপাখ্যানেরও কোনও রূপায়ণ মধ্যযুগের বাঙলা সাহিত্যে পাওয়া যায়না। শুধু বাঙলাতেই কেন, মধ্যযুগের অন্য কোনও ভারতীয় ভাষাতেই পাওয়া যায় না। যতদূর জানা গেছে, একমাত্র তেলেগু ভাষাতেই তেরো শতকে দণ্ডীর দশকুমার চরিতের একটি পদ্যানুবাদ হয় (১)। বত্রিশ সিংহাসন-পঞ্চতন্ত্রের মত উপকথাগুলিও কোনও সংস্কৃতেতর ভাষায় মুসলমান আমলের আগে লেখা হয়নি। পৌরাণিক কাহিনী বা জৈন্ আচার্য-তীর্থঙ্করদের জীবন-মাহাত্ম্য নিয়ে তামিল ও প্রাকৃত-গুজরাটিতে কাব্য বা 'রসবন্ধ' রচিত হয়েছে সত্য, এবং তাতে কিছুটা রোমান্টিক উপাদানও আছে, কিন্তু এর প্রত্যেকটিই ধর্মমূলক। প্রাচীন সংস্কৃতের ধারায় প্রণয়াবেগ নিয়ে অপভ্রংশে যে প্রথম ধর্মোদ্দেশনিরপেক্ষ বিশুদ্ধ কাব্য রচনা হয়েছিল, তার কবি বার শতকের মুসলমান; মুলতানের অধিবাসী, তন্তুবায় মীর হসনের

পুত্র আবদুর রহমানের প্রাকৃত কাব্য 'সন্দেশ-রাসক' সংস্কৃত দূত-কাব্যের অনুকরণ হলেও (২) বিষয়বস্তুর দিক দিয়ে ভারতীয় 'ভাষা'-সাহিত্যে নতুন পদক্ষেপ।

বৃহৎকথার মত অলৌকিক ঘটনাবহুল উপকথাজাতীয় কাহিনীগুলিও অপভ্রংশের যুগ ডিঙিয়ে একেবারে 'ভাষা'-সাহিত্যে স্থান পেল মুসলমানদের আমলে ও মুসলমানদেরই চেষ্টায়। ষোল শতকের মাঝামাঝি আকবরের উৎসাহে হিন্দুর পৌরাণিক গ্রন্থগুলির ফার্শি তর্জমা হওয়ার পূর্বে কোনও সংস্কৃতেতর ভাষাতেই পৌরাণিক উপাখ্যানগুলির সাহিত্যিক রূপায়ণ হয় নাই। বত্রিশ সিংহাসনের গল্পটিকে সর্বপ্রথম (ব্রজ) ভাষায় কাব্যরূপ দেন শাহজাহানের দরবারের 'কবিরাজ' সুন্দর (৩)। কাহিনীটির প্রতি মুসলমানরাই প্রথম আকৃষ্ট হয়, তার প্রমাণ ১৫৭৫ সালে আবদুল কাদের বদায়ুনি কৃত বত্রিশ সিংহাসনের ফার্শি তর্জমা 'খিরদ আফযা'। ঐসময়ে চতুর্ভুজ দাস নামের একজন হিন্দু কায়স্থ কাহিনীটির আর একটি ফার্শি অনুবাদ করেন (৪)। পঞ্চতন্ত্র-হিতোপদেশের গল্পগুলি বহু শতাব্দী পূর্বে Kalila-Dimna নামে পহলবী ও আরবীতে ভাষান্তরিত হয়ে হয়ে অবশেষে ফার্শির পোষাক পরেই ভারতে ফিরে এসেছিল। বাঙলা দেশে ১১—১২ শতকে এ গল্প-গুলির একটি সংস্কৃত রূপ দিয়েছিলেন নারায়ণ নামে এক কবি, কিন্তু বাঙলা ভাষায় হিতোপদেশ প্রথম রচনা করেন আঠারো শতকে হায়াত মামুদ (৫)। শুকসপ্ততি সংস্কৃত সাহিত্যের আর একটি সুপরিচিত 'কথা'। চৌদ্দ শতকের গোড়ায় এর ফার্শি অনুবাদ করেন জিয়াউদ্দিন নখ্‌শবী; আবুল ফজলও এর একটি ফার্শি সংস্করণ তৈরী করেছিলেন ষোল শতকের শেষের দিকে; সেই থেকে একাধিক ফার্শি অনুবাদ হয়েছে এ গল্পের (৬)। এবং ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের হিন্দির অধ্যাপক লাল্লুলালজী এই ফার্শি থেকেই এর প্রথম হিন্দি পদ্যানুবাদ করেন। ১৮৩৮ সালে দ্বারকানাথ কুণ্ড 'সুক সম্বাদ' নামে বাঙলাতে ফার্শি তুতীনামার প্রথম অনুবাদ করেন (৭)। কিন্তু ভারতীয় 'ভাষা'য় এ গল্পের প্রথম অনুবাদ করার কৃতিত্বও মুসল-মানের, গোলকুণ্ডার সুলতান আবদুল্লাহ কুতুব শাহের সভাকবি গওয়াসির, যিনি ১৬৪০ খৃষ্টাব্দে গল্পটি নিয়ে একটি 'দাকিনি' মসনবী রচনা করেন (৮)।

প্রাচীন গ্রীসের দর্শন-বিজ্ঞানের সাথে ইয়োরোপকে পুনরায় পরিচিত করানর

কৃতিত্ব যেমন মুসলমানের, তেমনই সংস্কৃত সাহিত্যের উপাদান ও ভাবকে মধ্যযুগের লৌকিক 'ভাষা'য় রূপদান করে ভারতের সাহিত্যিক ঐতিহ্যকে সমৃদ্ধ করার কৃতিত্বও তাদেরই।

ভারতীয় ভাষায় কল্পনাশ্রয়ী কাহিনীর ধারা প্রবর্তন আরবী-ফার্শি সাহিত্যের অনুপ্রেরণা থেকেই হয়েছে, একথা না বললেও চলে। মুসলমানরা এ সাহিত্য সঙ্গে করেই ভারতে এসেছিল। এ ভাষা দুটিতে, বিশেষ করে ফার্শিতে, ঘটনাবহুল রোমান্টিক কথা ও কাহিনীর সম্পদ অসাধারণ। আলেফলায়লার গল্পগুলি আরবীর মাধ্যমে প্রচারিত হলেও, এগুলির আসল ভিত্তি হচ্ছে অধুনালুপ্ত প্রাচীন পহ্লবী ভাষার 'হাজার আফসানা' নামক গল্পসংগ্রহ। আরবীর কল্পনাশ্রয়ী সাহিত্যের ঝোঁক বর্ণনা-বহুল, চিত্রময় কবিতার দিকে ; বাস্তব দৃশ্যজগতের পরিপ্রেক্ষিতে মানুষের চরিত্র, মন ও শক্তিমত্তার বৈচিত্র্য ও মাহাত্ম্য ঘোষণায়। উপাখ্যানজাতীয় গদ্য রচনা আরবীতে কম ; ক্লাসিকাল আরবীর নিজস্ব সৃষ্টি ঐজাতীয় রোমান্সের নমুনা সিরাতুল আন-তারা ; ১১—১২ শতকের পেশাদার কথকদের চেষ্টায় এ উপাখ্যানের যে রূপ দাঁড়িয়েছিল, তা বর্তমান যুগে মিশরে ছাপা হয়েছে ৩২ ভল্যুমে (১)। আনতারা ইব্‌নে শাদ্দাদ প্রাক-ইসলামি আরব কবিদের একজন ; সাব্‌আ-মুয়াল্লাকা'তে এঁর কবিতা আছে। কিন্তু এ উপন্যাসে তাঁকে বীরত্ব, সাহস, দাক্ষিণ্য, বাগ্মিতা ইত্যাদি বেদুঈনসুলভ মহৎ গুণাবলীর আদর্শ 'হিরো' হিসাবে চিত্রিত করা হয়েছে কতকটা মহাভারতের অর্জুনের মত, যদিও পরী দৈত্যের মত অলৌকিক ব্যাপার কাহিনীতে নেই। এ কাহিনীটি ফার্শিতে পৌঁছোয়নি, তবে আমীর হামজা উপাখ্যানের আমীর হামজা আন্‌তারা চরিত্রেরই ছায়াপাত বলে বোধ হয়; ফার্শির রোমান্টিক সাহিত্যে আরবের আর একটি দান হাতেম তাই এর বদান্যতা ও সৌজন্যের কাহিনী, যাকে কল্পনাপ্রবণ ইরান বহু বিচিত্র রঙে ও রূপে পল্লবিত করেছে।

(দুই)

যে সব উপাখ্যান আরবী-ফার্শির মারফত মুসলমানদের সাহিত্যিক ট্রেডিশনের অঙ্গীভূত হয়েছিল, তা প্রধানত দু'রকমের। একরকম হোল, ঘটনাবহুল এ্যাড-ভেঞ্চারের কাহিনী ; শাহনামার মত এ কাহিনী ইতিহাসের ভিত্তিতে গড়ে উঠতে পারে, কিম্বা নিছক কল্পনার সৃষ্টি হতে পারে। অতি মানবীয় বীরত্ব ও চাতুর্য,

পরীদৈত্যের সঙ্গে মানুষের যুদ্ধ ও কুটুম্বিতা, নানা অদ্ভুত ধরনের পশুপক্ষী ও গাছপালা, যাদুবিদ্যার হরেক রকমের কসরত প্রভৃতি অলৌকিক ব্যাপারের বাহুল্যময় বর্ণনায় পাত্রপাত্রীরা উপলক্ষ মাত্র ; plot এর বাঁধন শিথিল, ঘটনার কোনও নির্দিষ্ট লক্ষ্য নেই। শ্রোতাদের কৌতূহল অনুসারে কবি ও কথকদের চেষ্টায় কাহিনীটি দীর্ঘ হতে দীর্ঘতর হতে থাকে। এসব উপাখ্যানে মানুষ বা পরীর প্রণয় ও মিলনের ঘটনাও থাকে, কিন্তু প্রণয়াবেগ কাহিনীর আসল বিষয়বস্তু নয়। আর নায়ক নায়িকা বা প্রধান পাত্রপাত্রীরা একরকম কালজয়ী ; দু'শো তিনশো বছর ধ'রে নায়ক যুদ্ধ ও প্রেম-চর্চা করে থাকে, পুত্রপৌত্রবতী শতাধিক বৎসরের নায়িকার সৌন্দর্য ও যৌবনে মুগ্ধ হয়ে বহু বিবাহিত নায়ক পৃথিবী তোলপাড় করে বেড়ায়, কিন্তু তারই মধ্যে স্বপ্নে বা হঠাৎ দেখা একাধিক সুন্দরীর প্রেমে পড়ে তাদের পাণিগ্রহণও করে যায় বিনা দ্বিধায়। এ উপাখ্যানগুলির ঘটনা, দৃশ্য ও চরিত্রগুলি repetitive, তাই যেন শেষ হতে চায় না। অক্সফোর্ডের Bodlian Library তে ১২ শতকের লেখা 'Kitab Samak-Ayyar' নামে এই রকম একটি ফার্সি গদ্যোপাখ্যানের পুঁথি আছে। তিন খণ্ডের দুহাজার পৃষ্ঠাতেও কাহিনীটি শেষ হয় নাই। চার পুরুষ ধরে নায়ক নায়িকার বিবাহপূর্ব কাণ্ড কারখানা চলছে, আর কতদিন পরে তাদের মিলন হোল জানার সম্ভাবনা নেই, কারণ পুঁথিটির বাকি খণ্ডগুলি পাওয়া যায়নি (১০)।

অসম্ভব ও আজগুবি কাণ্ড থাকলেও এধরণের উপাখ্যানগুলি নেহাৎ ছেলে-ভুলোনো রূপকথা নয়। রূপকথার কাজ সহজ, বিশ্বাসপ্রবণ কল্পনাবিলাসী action প্রিয় মনের খোরাক জোগান, প্রণয় বা বীরত্বের লোমহর্ষক বিবরণ সেখানে গৌণ। লোকগাথা (folktale)র বৈশিষ্ট্যও এ উপাখ্যানগুলিতে তেমন নাই, কারণ সাধারণ মানুষের সুখ-দুঃখ, সাধ আহ্লাদ ও জীবন চর্যার যে বাস্তব পরিবেশ থেকে folk-tale গড়ে ওঠে তার প্রতিফলন গল্পগুলিতে পাওয়া যায় ; ভেলুয়া-সুন্দরী বা দেওয়ানা মদীনার কাহিনীতে স্থান ও কালের পরিপ্রেক্ষিতে সরল, অনাড়ম্বর, কিছুটা অমার্জিত মাটির মানুষকে ধরাছোঁয়া যায়। ফার্শি উপাখ্যানগুলিতে তা সম্ভব নয়, কারণ শুধু গল্পের কুশীলবরাই নয়, এর প্রতিটি ঘটনাকেই আদর্শায়িত করে বর্ণনা করা হয়ে থাকে। এরূপ স্বেচ্ছাকৃত অতিরঞ্জন ইরানের যুদ্ধামোদী রাজদরবার ও নাগর সমাজের মানসা-

ভ্যাসের প্রতিফলন, যার প্রকাশ ক্লাসিকাল ইরানের সংস্কৃতির নানা দিকে দেখা যায়। ইরানের যে লিখিত সাহিত্যের সঙ্গে পৃথিবী পরিচিত, তার সবই দরবারী শ্রোতা ও পাঠকের জন্য ; তাই, ইরানি folktale এর কোনও নমুনা ফার্শি সাহিত্যে আছে বলে শোনা যায়নি।

এই দরবারী 'কথা' সাহিত্যের আর একটি শাখা প্রণয়োপাখ্যান। আসলে এগুলি এ্যাডভেঞ্চার কাহিনীর বিভিন্ন episodeএরই মার্জিত রূপ, যেমন শিরী-খসরু-ফরহাদের গল্প শাহনামারই অংশ; ইয়ুসুফ-জোলেখার রোমান্সের উপাদান কোরান-বাইবেলেই আছে। ফিরদৌসির আগে এ কাহিনী নিয়ে আরও দুটি কাব্য রচনার কথা জানা যায়। পদ্যে ও গদ্যে আরও অনেকেই গল্পটিকে রূপ দিয়েছেন। কিন্তু সবচেয়ে খ্যাতিলাভ করেছে ১৫ শতকের কবি আবদুর রহমান জামীর কাব্য ইয়ুসুফ জুলেখা। 'Wis ও Ramin' ও 'Wamiq ও Azra'র মত প্রাক-ইস্‌লামি ইরানের প্রণয়কাহিনী নিয়েও ১১-১২ শতকে ফার্শি কাব্য রচনা হয়েছে ; শেষোক্ত কাহিনীটির তুর্কী অনুবাদ থেকে আঠারো শতকের শেষের দিকে উর্দুতে কাব্য রচনা হয়। আরও পুরোনো ইরানি রোমান্সের উল্লেখ প্রাচীন গ্রীক লেখকরাই করেছেন ; স্বপ্নে দেখে নায়ক-নায়িকার প্রণয়াবিষ্ট হওয়ার প্রাচীনতম ইরানি রোমান্স 'Zariadres ও Odatis' (১১) এর প্রভাব সংস্কৃত সাহিত্যের প্রথম প্রণয়কাহিনী সুবন্ধুর বাসবদত্তায় সুস্পষ্ট। ১৩ শতকের এক ইরানি মুসলিম কবি খাজু কিরমানীও এই প্রাচীন ইরানি উপাদান অবলম্বন করে 'Humay ও Humayun' এর প্রেমকাব্য রচনা করেন। এ উপাখ্যানগুলিতে প্রেমের সাধনা একনিষ্ঠ ও ঐকান্তিক হলেও কাহিনীগুলি মিলনান্তক ; ফরহাদের ব্যর্থ প্রেম বা ইয়ুসুফ কর্তৃক জুলেখার প্রেম প্রত্যাখ্যানের বেদনা কাহিনীগুলির মূলসুর নয় ; কতকটা সংস্কৃত প্রণয়কাব্যের মত, ঘটনা, পরিবেশ ও পাত্রপাত্রীর উপমাবহুল বর্ণনার দিকেই কাহিনীগুলির ঝোঁক ; plotএর পরিকল্পিত পরিণতির প্রতি কাহিনীকার যেন সচেতন নয়।

এর একমাত্র ব্যতিক্রম লায়লা-মজনু। গল্পটির পাত্রপাত্রী আরবী হলেও, এর সাহিত্যিক রূপ একান্ত ভাবে ফার্শির। কোনও আরবী লোককাহিনী থেকে এর জন্ম

কিনা তা জানা যায়নি। তবে 'মজনুন' বলে খ্যাত কায়্‌স্‌ নামক এক প্রাক-ইসলামি আরব কবির রচিত প্রেমের আবেগময় কবিতার একটি সংগ্রহ আছে, যদিও পণ্ডিত-দের মতে এ নামের কোনও কবির অস্তিত্বই ছিলনা।

সে যাই হোক, এ গল্প নিয়ে ফার্শিতে প্রথম কাব্য রচনা করেন ১২ শতকের কবি নিজামী। মানবীয় প্রেমের যে একনিষ্ঠ, নিষ্কাম রূপের কল্পনা এ কাব্যে স্থান পেয়েছে, দরবারী ফার্শি উপাখ্যান সাহিত্যের সাথে তার মৌলিক তফাৎ। এ রূপ আরবী কাব্যেও পাওয়া যায়না, গ্রীক বা সংস্কৃত সাহিত্যেও তার নজীর নাই। প্রেমের এ দেহোত্তর কল্পনা এসেছে মরমীয়া সুফিবাদের অনুপ্রেরণায় যার প্রথম দৃষ্টান্ত পাই রাবেয়া বাসরীর আধ্যাত্মিক প্রেমের কবিতায়, আর ফার্শি কাব্যে যার সবচেয়ে বিখ্যাত উদাহরণ হাফেজের রুবায়ী। লায়লা মজনুর প্রেমের একনিষ্ঠ সাধনার ফলে যে মিলন সে ইহজগতের নয়; মরজগতের বিচ্ছেদ বেদনা অনন্ত-মিলনের প্রস্তুতি, তাই নিজামী এঁদের মিলনের চিত্র এঁকেছেন বেহেস্তে। ১২ শতক থেকে দেহোত্তর প্রেমের এই কল্পনা ফার্শি কাব্যের প্রধান অভিব্যক্তি হয়ে দাঁড়ায়। নিজামী তাঁর অন্যকাব্য হপ্তপয়করেও সুফীদের আধ্যাত্মিক প্রেমকে রূপকের ভঙ্গিতে প্রকাশ করেছেন। দিল্লীর কবি আমীর খসরুও 'শিরী খসরু' ও 'লায়লা মজনু'র কাহিনীকে আধ্যাত্মিকতার ছাঁচে ঢেলেছেন। ১৫ শতকে জামীও ইয়ুসুফ জুলেখার রোমান্স নিয়ে এই প্যাটার্নেই কাব্য রচনা করেন। জুলেখার দেহগত প্রেম বিরহের আগুনে পুড়ে নিষ্কাম ইন্দ্রিয়াতীত প্রেমে পরিণত হয়েছে।

ফার্শির এই এ্যাডভেঞ্চার ও প্রণয়মূলক উপাখ্যান থেকে উপাদান ও প্রেরণা পেয়ে মধ্যযুগের ভারতীয় 'ভাষা'য় যে কাহিনীকাব্যের সূত্রপাত হোল, আওধি হিন্দিতেই বোধহয় তার প্রথম দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। জায়সীর রচনাতে তো বটেই, কুতুবানের মৃগাবতীও লায়লা মজনুর মত আধ্যাত্মিক প্রেমের রূপক, তাতে সন্দেহ নাই। আধ্যাত্মিকতাবর্জিত মিলনান্তক ফার্শি প্রেমকাহিনীর রীতিতে উপাখ্যানকাব্য রচনার দৃষ্টান্তও হিন্দিতে দেখা যায় ঐ সময়েই। রোমান্টিক কাব্যের প্রথম নমুনা হিসাবে সুকুমার সেন ১৫১৬ সালে কবি দামোর রচিত 'লক্ষ্মণ সেন-পদ্মাবতী কথার' উল্লেখ করেছেন। মাধবানল-কামকন্দলার একনিষ্ঠ প্রেম নিয়েও তিনখানি হিন্দি কাব্য

রচনা হয়েছিল মোগল আমলের গোড়াতেই ; তার মধ্যে একটির লেখক মুসলমান, আকবরের সমসাময়িক, নাম আলম।

কিন্তু এনামুল হকের দেওয়া মুহম্মদ সগীরের তারিখ মেনে নিলে, ফার্শি রীতিতে প্রণয়কাহিনী রচনার প্রথম কৃতিত্ব বাংলারই প্রাপ্য হয়। মুহম্মদ সগীর ১৪ শতকের লোক হলে, তাঁর 'ইয়ুসুফ-জুলেখা'ই মধ্যযুগের ভারতীয় ভাষায় প্রাচীনতম রোমান্টিক কাব্যকাহিনী, যাতে 'প্রেমরসে ধর্মবাণী' শোনান হয়েছে।

(তিন)

ফার্শি উপাখ্যানের রীতিতে বাঙলা ভাষায় রচিত এইরকম একটি কাহিনী 'গুলে বকাওলী'। এনামুল হক এ কাহিনীর তুটি বাঙলা কাব্যের উল্লেখ করেছেন : চট্টগ্রামের মুহম্মদ নওয়াজেস খানের 'তাজুলমুলুক-গোলেবকাওলী', রচনাকাল ১৬৩৮ খৃঃ ; আর ১৭৬০—১৭৭০ এর মধ্যে রচিত চট্টগ্রামেরই আর এক কবি মুহম্মদ মুকীমের 'গোলেবকাওলী'। সুকুমার সেন আরও কয়েকটির উল্লেখ করেছেন ; এগুলি সবই উনিশ শতকের রচনা ও কলকাতায় ছাপা। উমাচরণ মিত্র ও প্রাণকৃষ্ণ মিত্র "পারসিক বকাঅলি গ্রন্থ বঙ্গভাষায় পয়ারাদি নানাচ্ছন্দে" রচনা করে শ্রীরামপুর থেকে প্রকাশ করেন ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে। মির্জাপুরের এরাদত আলি রচিত একটি গোলে-বকাওলী ছাপা হয় ১৮৫৭ সালে। আবতুল শুকুর ওরফে মানিক মিঞা রচিত আর একটি কাব্যেরও উল্লেখ করেছেন সুকুমার বাবু, বিবরণ দেন নাই (১২)।

মূল কাহিনীটি যে অন্য ভাষা থেকে নেওয়া, একথা প্রত্যেক কবিই স্বীকার করেছেন। এক এরাদত আলিই এটিকে "হিন্দি ভেঙ্গে বঙ্গ ভাষায়" রচনা করেছেন। অন্য সকলেই মূল ফার্শিকে অবলম্বন করেছেন। হিন্দিতে এ কাহিনীর কোনও গদ্য বা পদ্য রচনার সন্ধান পাওয়া যায় না। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের মুন্সি নেহালচন্দ্ লাহোরীই সর্বপ্রথম ফার্শি থেকে গুলেবকাওলীর কাহিনী উর্দু গদ্যে অনুবাদ করে 'মজ্ হাবে এশ্‌ক' নামে প্রকাশ করেন ১৮১৪ সালে। এই অনুবাদ থেকেই ১৮৩৮ সালে পণ্ডিত দয়াশঙ্কর নসীম 'গুলজারে নসীম' নামে গুলেবকাওলীর কাহিনী কাব্যে রচনা করেন (১৩)। এরাদত আলি খুব সম্ভব এই উর্দু রচনা অবলম্বন করেছিলেন।

ইরানের ফার্শি সাহিত্যে এ কাহিনী পাওয়া যায় না। নেহালচন্দ যে মূল ফার্শি থেকে অনুবাদ করেন 'গুলেবকাওলী' কাহিনীর সেইটিই একমাত্র ফার্শ version, এটি মসনবীতে রচিত। এর লেখক বাঙালী মুসলমান, নাম শেখ ইজ্জতুল্লাহ 'বাঙালী'। India office, Oxford, Berlin, Bankipur ও কলকাতায় ফার্শি 'তাজুলমুলুক গুলেবকাওলী' কাব্যের হস্তলিপি আছে; কোনও ছাপা সংস্করণ নাই। Berlin এর একটি পুঁথির লিপিকাল ১৭৮৮ সাল, স্থান মানিকপুর (১৪)।

শেখ ইজ্জতুল্লাহ ১৭—১৮ শতকে বেঁচেছিলেন। ভূমিকায় কাহিনী রচনা শেষ হবার তারিখ দিয়েছেন ১১৩৪ হিজরী (১৭২২ খৃঃ)। ন' বছরের পুরোনো বন্ধু ও সুহৃদ নজর মোহাম্মদের অনুরোধে তিনি কাব্যরচনা শুরু করেন, কিন্তু বন্ধুর আকস্মিক মৃত্যুর শোকে উন্মাদপ্রায় হয়ে গিয়ে 'সমস্ত লিখিত কাগজগুলি চোখের পানিতে ধুয়ে ফেলে দিতে' চাইলে অন্য বন্ধুদের ঐকান্তিক অনুরোধে তিনি রচনাটি সম্পূর্ণ করেন (১৫)।

এঁর জীবনবৃত্তান্ত আর কিছু পাওয়া যায় না; উত্তর ভারতে রচিত কবি-সাহিত্যিকদের 'তাজকিরা'গুলিতেও এঁর কোনও উল্লেখ পাইনি। অথচ এর কাব্যটি আঠারো—উনিশ শতকের উত্তর ভারতীয় ফার্শি ও উর্দু রোমান্টিক সাহিত্যে গভীর রেখাপাত করেছিল। পাঁচ হাজার উর্দু রেখ্‌তা কবিতায় এই কাহিনীর আর একটি সংস্করণ ১৭৩৮ খৃঃ 'তুহফা-এ-মজলিসে সালাতিন' নামে রচিত হয়। ১৭৯৮ সালে রায়হান নামক এক লেখক 'খইয়াবান' নাম দিয়ে এর আরও একটি উর্দু পদ্যানুবাদ করেন। এটি আরও বড়, প্রায় দশ হাজার মস্‌নবীতে সমাপ্ত। উর্দুর প্রথম অভিনীত নাটক ১৮৫২—৫৩ সালে লখনৌএ রচিত আমানতের 'ইন্দার সভা'ও এই গোলে-বকাওলী কাহিনীরই নাট্যরূপ (১৬)।

Berlin এর একটি পুঁথিতে ফার্শি গুলেবকাওলীর লেখকের নাম লেখা আছে এনায়েতুল্লাহ। কলকাতার এশিয়াটিক সোসাইটির একটি পুঁথিতে শেখ গরীবুল্লার নাম পাওয়া গেছে (১৭)। দ্রুত লিখিত 'নাস্তালিক' অক্ষরে ইজ্জতুল্লাহ, এনায়েতুল্লাহ বা গরীবুল্লাহে রূপান্তরিত হওয়া আশ্চর্য নয়। হুগলী জেলার বালিয়া পরগণার হাফিজপুর

গ্রামের গরীবুল্লাহ বা ফকীর শাহ গরীবুল্লার বাঙলা ইয়ুসুফ জুলেখা ও অসম্পূর্ণ জঙ্গনামা ও আমীর হামজার কাব্য পাওয়া গেছে। এ কাব্য দুটি সম্পূর্ণ করেন মুহম্মদ ইয়াকুব ও সৈয়দ হামজা। ইয়াকুবের রচনাকাল সতেরো শতকের শেষ পাদে; গরীবুল্লার সাথে তাঁর সাক্ষাৎ পরিচয় ছিল। সৈয়দ হামজা ১৮ শতকের শেষার্ধের লোক; গরীবুল্লাকে তিনি গুরু বলে প্রণতি জানিয়েছেন, সাক্ষাৎ পরিচয়ের ইঙ্গিত দেননি। তবে শাহ ইজ্জতুল্লাহ নামে আর এক ব্যক্তির আদেশে তিনি 'হাতেমতাই' এর উপাখ্যান ফার্সি থেকে বাঙলা কাব্যে অনুবাদ করেছিলেন।

এঁরা সবাই ১৮ শতকের গোড়ায় হুগলী জেলার ভুরস্ুট বালিয়া পরগণায় ছিলেন। দোভাষী বাঙলা পুঁথি সাহিত্যের প্রচলন ও প্রসার এ অঞ্চলের মুসলমান লেখক ও প্রকাশকদের উৎসাহেই হয়। এই দোভাষী পুঁথিতে ব্যবহৃত উপাখ্যানের সমগোত্রীয় কাহিনী গুলেবকাওলীর লেখক শেখ ইজ্জতুল্লাহ 'বাঙ্গালি' এঁদেরই কেউ বা এঁদের সমসাময়িক ও এই ভুরশুট-বালিয়া অঞ্চলেরই কেউ কিনা খুঁজে দেখা উচিত। চট্টগ্রামের কবি নওয়াজেশ খান যে ফার্শি পুস্তক থেকে তাঁর বাঙলা 'গোলেবকাওলী' কাব্য রচনা করেছেন বলে উল্লেখ করেছেন, সে পুস্তকটি যদি এই ইজ্জতুল্লাকৃত 'তাজুলমুলুক গোলেবকাওলী' হয়, তাহলে নওয়াজেস খানের যে তারিখ (১৬৩৮ খৃঃ) এনামুল হক নির্ধারণ করেছেন, তার পুনর্বিচার করতে হয় (১৮)।

ইজ্জতুল্লাও আসলে এ কাহিনীর মূল রচয়িতা নন। তিনি এটি হিন্দি থেকে নিয়েছেন বলে উল্লেখ করেছেন। হিন্দিতে এর কোনও লিখিত version ছিল কিনা তার কোনও সাক্ষ্য পাওয়া যায় না। তবে 'দাকিনী' (দাক্ষিনাত্যের প্রাচীন উর্দু) ভাষায় ১০৩৫ হিজরীতে (১৬২৫ খৃঃ) রচিত একটি গুলেবকাওলী কাব্যের সন্ধান পাওয়া গেছে (১৯)। এর একটি হস্তলিপি লখ্নৌর ওয়াজিদ আলি শাহের গ্রন্থাগারে ছিল। লেখকের নাম বা অন্য বৃত্তান্ত জানার উপায় নেই, কারণ পুঁথিটির বর্তমানে কোনও খোঁজ পাওয়া যায় নি। তবে Ethe ও Garcin de Tassyর উদ্ধৃতি ও আলোচনা থেকে প্রমাণ হয়েছে যে ইজ্জতুল্লার ফার্সি মসনবীটি এই 'দাকিনি' কাব্যকাহিনীরই পল্লবিত রূপ (২০)।

কাহিনীটির পাত্রপাত্রীদের মধ্যে হিন্দু মুসলমান নাম আছে; দৈত্য ও

অপ্সরার বদলে মুসলমান mythology অনুযায়ী হজরত সুলেমানের আজ্ঞাবাহী প্রজা জেনপরীর অবতারণা আছে। কিন্তু স্বর্গরাজ ইন্দ্রের সভায় নৃত্যে অমনোযোগের অপরাধে পরীর পাথরে পরিণত হওয়ার পৌরাণিক উপাদান প্লটের একটি অপরিহার্য অংশ। সিংহলের রাজা চিত্রসেনের কন্যা চিত্রাবতীর সাথে নায়ক তাজুলমুলুকের বিবাহ, সিংহলের দেবীমন্দীরে প্রস্তরীভূত পরীর জন্য তাজুলমুলুকের যুগান্তব্যাপী তপস্যা, অবশেষে কৃষকের কন্যারূপে পরীর জন্মগ্রহণ ও নায়কের সাথে পুনর্মিলন এবং চিত্রাবতী ও আরও দুইটি স্ত্রীর সাথে পরী-সমভিব্যাহারে নায়কের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন ইত্যাদি ঘটনার বিন্যাস দেখে বোঝা যায় যে মুসলমানি পোষাক থাকলেও কাহিনীটি আসলে ভারতীয়।

এটি খুব সম্ভব মধ্য ভারতের কাহিনী। এ অনুমানের সপক্ষে একটি নজীর 'ফারহাঙ্গে-আসাফিয়ার' লেখক সৈয়দ আহমদ দিয়েছেন। অন্ধ পিতার দৃষ্টি ফিরিয়ে আনার জন্য গুলেবকাওলী নামক একরকম দুর্লভ ফুলের অন্বেষণে বেরিয়েই নায়ক তাজুলমুলুক নানা এ্যাডভেঞ্চারে জড়িয়ে পড়েন। জব্বলপুর ও অমর কণ্টকের পার্বত্য অঞ্চলে পানির ধারে বকাওলী নামে একরকম লতা এখনও জন্মায় যার হলুদ রঙের ফুল চোখের পীড়ার জন্য খুব উপকারী বলে লোকের বিশ্বাস। নর্মদা-চম্বল নদীর উৎপত্তি নিয়ে একটি রূপক কাহিনীও বহু প্রাচীন কাল থেকে প্রচলিত বলে সৈয়দ আহমদ সন্ধান পেয়েছিলেন; এ রূপকথাটিও বকাওলীর গল্প নামে পরিচিত, যদিও প্রচলিত গুলেবকাওলীর রোমান্সের সাথে এর কোথাও মিল নাই (২১)।

(চার)

এর উৎপত্তি যেখানেই হোক, কাহিনীটি যে দাক্ষিণাত্য থেকে বাঙলা দেশে এসেছিল তাতে সন্দেহ নাই। শুধু এইটিই নয়, মধ্যযুগের বাঙলা সাহিত্যে রূপায়িত আরও কয়েকটি কাহিনীও এই ভাবেই বাঙলা দেশে এসেছিল বলে মনে হয়। দৌলত উজীরের লোরচন্দ্রানী কাব্য ১৬৬০—৩৮ সালের মধ্যে আরাকানে লেখা হয়। এ কাহিনীটি একান্ত ভারতীয়। সুকুমার সেন চৌদ্দ শতকের বর্ণরত্নাকরে এ কাহিনীর উল্লেখ পেয়েছেন। এর কোনও ফার্শি সংস্করণ নাই। কিন্তু গোলকুণ্ডার সুলতান আবদুল্লাহ কুতুব শাহের সভাকবি গওয়াসি 'দাকিনী' মসনবীতে চন্দ্রা-লোরকের

কাহিনী রচনা করেন ১৬২৫ খৃষ্টাব্দের এর পূর্বে। এর একটি হস্তলিপি হায়দারাবাদের আসফিয়া লাইব্রেরীতে আছে(২২)। এই রকম আর একটি রোমান্স সায়ফুলমুলুক-বদিউজ্জামাল আলেফলায়লার একটি বিখ্যাত গল্পের ফার্শি গদ্যানুবাদ। গওয়াসি এ গল্প নিয়েও প্রথম রোমান্টিক কাব্য লেখেন ১৬২৫ খৃষ্টাব্দে (২৩)। ১৬৬০-৭০খৃষ্টাব্দে রচিত আলাওলের ঐ নামের বাঙলা কাব্যের কাঠামোর সঙ্গে গওয়াসির কাহিনীর সাদৃশ্য লক্ষণীয় (২৪)। আরাকানেরই আর এক কবি আবদুল করীম 'তমীম আনসারী' কাব্য রচনা করেন ১৬৯৮ খৃষ্টাব্দের পূর্বে। এটিও আলি মোহাম্মদ রচিত মুল ফার্শি গদ্য কাহিনী থেকে প্রথমে 'দাকিনী' পদ্যে অনুবাদ করেন সানআতি নামক বীজাপুরের এক কবি ১৬৪০—৪৫ খৃষ্টাব্দে (২৫)।

সমুদ্রপথে গোলকুণ্ডা-বীজাপুরের সাথে আরাকানের যোগাযোগ থাকা খুব স্বাভাবিক। বঙ্গোপসাগরের দুই তীরে জাহাজের যাতায়াত যে খুবই ছিল তার অন্ততঃ একটা প্রমাণ হায়দারাবাদের সরকারী দপ্তরখানার কাগজ থেকে দেওয়া যেতে পারে। আওরঙ্গজেবের কাছে পরাজিত শাহ সুজা আরাকানে আশ্রয় নেওয়ার-পর আরাকান-রাজ কর্তৃক নিহত হলে, তার পুত্র আপন ভগ্নীদের সম্ভ্রমহানির ভয়ে বন্দী অবস্থায় তাঁদেরকে হত্যা করেন। এই খবর গোলকুণ্ডা রাজ্যের ভিশাখাপট্টন বন্দরে পৌঁছোয় আরাকান থেকে আগত এক জাহাজের নাবিকের মারফৎ ১৬৬১ সালের ১৭ই আগষ্টে। সেখানকার সরকারী সংবাদ লেখক (ওয়াকেয়া নবীস্) এ খবরের সত্যতা যাচাই করতে চাইলে মীরজুমলার নৌবহরের আর একটি জাহাজ আরাকান থেকে ঘটনাটির একটি লিখিত বিবরণ সংগ্রহ করে মুসলিপত্তন বন্দরে এসে পৌঁছায় ৩০শে আগষ্ট এবং ঐদিনকার খবরের সঙ্গে সেটি রাজধানী হায়দরাবাদে পাঠান হয় (২৬)।

আরাকানের মাধ্যম ছাড়াও বাঙালী মুসলমানের সঙ্গে দাক্ষিণাত্যের সাহিত্যিক যোগাযোগের আভাস পাওয়া যায়। সৈয়দ সুলতানের রচিত বাঙলা কাব্য 'জয়কুম রাজার লড়াই' এর দাকিনী মস্‌নবীতে লিখিত একটি সংস্করণ আছে হায়দরাবাদের আসফিয়া লাইব্রেরীতে। এর লেখক ফজল বিন মুহাম্মদ। এর তারিখ জানা যায়নি ; পুঁথির লিপিকাল ১৬২৩ হিজরী। এঁরই আর একটি দাকিনী মস্‌নবীতে লেখা কাব্য আছে, 'কিস্‌সা-এ-জায়তুন' বা 'জঙ্গনামা মুহম্মদ হানিফ'। বাঙলাতে এ গল্প নিয়ে

প্রথম কাব্য রচনা করেন সৈয়দ হামজা ১৭৯৭ খৃঃ (২৭)। ফার্শিতেও হজরত মুহম্মদ ও আলীর সঙ্গে 'বাদশাহে জয়কুমের লড়াই' ও চান্দালশাহের কন্যা 'জয়তুন বা জয়গুন পাক দামান বিবির' যুদ্ধ ও প্রণয়কাহিনী আছে গদ্যে। তবে তার রচনাতারিখ বা লেখকের নাম কিছুই জানা যায় না (২৮)। এই মূল ফার্শি কাহিনী থেকেও সৈয়দ সুলতান ও সৈয়দ হামজা তাঁদের কাব্যের আখ্যানভাগ নিয়ে থাক্‌তে পারেন। কিন্তু তাহলেও, এ ফার্শি কাহিনীও যে বীজাপুর-গোলকুণ্ডা থেকেই বাঙলা দেশে এসেছিল, একটি ঐতিহাসিক কারণে এ সন্দেহ হয়।

চৌদ্দ শতকে বাহমনী সাম্রাজ্য স্থাপন হওয়ার সময় থেকেই দাক্ষিণাত্যে ইরানী সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রসার ও প্রতিপত্তি বাড়তে থাকে। বাহমনী রাজবংশ নিজে-দেরকে ইরানী মনে করত; ১৭ শতকের শেষে এ সাম্রাজ্য ভেঙে যে কয়টি রাষ্ট্র গড়ে উঠ্‌ল, তাদের প্রতিষ্ঠাতারাও ইরানী বংশোদ্ভুত ছিলেন। এঁরা ইরানের সঙ্গে সাংস্কৃতিক যোগ আরও ঘনিষ্ট করতে যত্নবান ছিলেন, এবং এদের চেষ্টায় সমুদ্রপথে ইরান থেকে কবি, সাহিত্যিক ও ফার্শি গ্রন্থের অজস্র আমদানী হতে থাকে। রাজ-কার্যেও ইরানীদের চাহিদা ছিল। উপঢৌকন পাঠিয়ে ইরান থেকে বিশিষ্ট পণ্ডিত ও কবিকে আমন্ত্রণ করা হোত। শিরাজের কবি হাফেজও এভাবে আমন্ত্রিত হয়ে সমুদ্র যাত্রার বিপদের জন্যই দাক্ষিণাত্য আসার সঙ্কল্প ত্যাগ করেন।

ষোল শতকের গোড়ায় তাইমুরের শেষ বংশধর হোসেন বায়কারাকে যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত করে সাফাভি বংশের প্রতিষ্ঠাতা শাহ ইসমাইল ইরানে শিয়া রাজত্ব স্থাপন করেন। এ বংশ ছিল গোঁড়া শিয়া। প্রথম ৩।৪ জন সাফাভি সুলতান ইরানের সুন্নি-দের উপর কঠোর নির্যাতনও চালিয়েছিলেন। সুন্নি নির্যাতনের সঙ্গে সঙ্গে সাফাভিরা শিয়া ধর্মপ্রচারেরও নানাভাবে চেষ্টা করেন। শেরশাহ কর্তৃক ভারতবর্ষ থেকে বিতাড়িত হুমায়ুনকে ইরানে আশ্রয় দিয়ে তাঁকে শিয়া ধর্ম গ্রহণ করবার জন্য শাহ তাহমাস্‌প্‌ খুবই পীড়াপীড়ি করেছিলেন। ধর্মপ্রচারের সঙ্গে সঙ্গে শিয়া ধর্মতত্ব, ইতিহাস ও উপাখ্যান নিয়ে গদ্য ও পদ্য রচনাও হতে থাক্‌ল এ সময়ে অজস্র পরিমাণে। এই সাফাভি রাজত্বের উৎসাহেই মহরমের 'তাজিয়া' তার বর্তমান রূপ পরিগ্রহ করে। 'তাজিয়া'র সঙ্গে আবৃত্তির জন্য কারবালার ঘটনা নিয়ে 'মার্শিয়া'

(শোক-গাথা) কাব্যের প্রচলনও হয় এই ষোল শতক থেকেই। এ সময়কার ফার্শি 'মার্শিয়া'র মধ্যে শাহ তাহমাস্পের আশ্রিত মুহতাশাম কাশানীর রচিত (১৫৮৮ খৃঃ এঁর মৃত্যু হয়) 'হফ্ত বন্দ' সবচেয়ে বিখ্যাত ও জনপ্রিয় ছিল (২৯)। শিয়া ধর্মোপাখ্যান নিয়েও পুস্তক রচনা হয়। আলী ও মুহম্মদ হানিফাকে ঘিরে যেসব রোমান্স ও উপকথা ফার্শির মারফৎ ভারতে পৌছে আরও পল্লবিত হয়েছে, তার প্রায় সবই সাফাভি আমলের লেখা। আমীর হামজাকে কেন্দ্র করে শাহনামার প্যাটার্ণে মুল্লা জালাল বালখী ফার্সি গদ্যে যে বিরাট 'দাস্তানে আমীর হামজা' রচনা করেছিলেন হুমায়ুন তার প্রথম চিত্রিত হস্তলিপি তৈরী করান ইরান থেকে প্রত্যাবর্তনের পর। হুমায়ুনের সঙ্গে এবং তারপর থেকেই ইরানের বহু সাহিত্যিক, বণিক ও ভাগ্যান্বেষী মোগল ভারতে আস্তে থাকে। তা সত্বেও, 'মহরম' ও 'তাজিয়াতে' 'মার্শিয়া' পাঠ বা অনুরূপ শিয়া ধর্মচর্চার রেওয়াজ সতেরো শতকের শেষ পর্যন্ত উত্তর ভারতে গড়ে ওঠেনি। আওরঙ্গজেব এরকম শিয়া প্রথাকে পৌত্তলিকতার শামিল মনে করতেন। উত্তর ভারতের ফার্শি সাহিত্যে তাই 'মার্শিয়া'জাতীয় কোনও কাব্যরচনার নজীর পাওয়া যায় না। উর্দু 'মার্শিয়া' কাব্য আরম্ভ হোল আঠারো শতকের শেষের দিকে, যখন উত্তর ভারতের কয়েকটি প্রদেশে শিয়া রাজবংশের প্রতিষ্ঠা হয়েছে, এবং 'দাকিনী' কাব্য সাহিত্য উর্দু 'রেফ্তার' অন্তর্গত হয়ে গেছে।

রাজনৈতিক কারণ তো ছিলই, ধর্মীয় কারণেও সাফাভিদের সঙ্গে তাইমুর বংশীয় সুন্নি মোগলদের চিরন্তন শত্রুতা ছিল। উত্তর ভারতে ফার্সি সাহিত্য চর্চা হতে থাকলেও মোগল সাম্রাজ্যে সাফাভিদের শিয়া ধর্ম-সংস্কৃতির প্রসার তাই তেমন হতে পারেনি। ঠিক এই কারণেই মোগলদের শত্রু দাক্ষিণাত্যের মুসলিম রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে সাফাভিদের সম্বন্ধ আরও ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠে। এবং তার ফলে, শিয়া ধর্ম সাহিত্যের প্রসারও বাড়তে থাকে। বীজাপুরের মাধ্যমে শিয়া ধর্মপ্রচারক, কবি ও পণ্ডিত দাক্ষিণাত্যে ছড়িয়ে পড়েন ও শিয়া ধর্মীয় কাব্য ও উপাখ্যানের সর্বত্র সমাদর হতে থাকে। সাফাভি ইরানের সাংস্কৃতিক প্রভাবের ফলে ষোল শতকের মাঝামাঝি বীজাপুর, আহমদনগর ও গোলকুণ্ডার সুলতানেরা শিয়া ধর্ম গ্রহণ করেন এবং সোৎসাহে সাফাভিদের 'এমামিয়া' শিয়া সম্প্রদায়ের ধর্মমতের প্রসার ও চর্চা করতে

থাকেন। বীজাপুর গোলকুণ্ডার সমগ্র মহরম পর্বই সরকারী ব্যয়ে অনুষ্ঠিত হোত। গোলকুণ্ডায় দুটি সরকারী 'আস্তুরখানা' ছিল। সেখানে মহরমের মাসে আড়ম্বরের সাথে প্রতিদিন 'মার্শিয়া' পাঠ হোত; সমস্ত রাজ্যে মাংস ও পানের দোকান বন্ধ থাকত। হিন্দু মুসলমান সবাই মিছিলে যোগ দিয়ে কারবালার মাতম করত। এই মাতম উপলক্ষে প্রথম প্রথম উপরোক্ত মুহতাশাম্ কাশানীর ফার্সি 'হফ্‌ত্‌ বন্দ্‌' পড়া হোত, কিন্তু শীঘ্রই দাকিনীতেও 'মার্শিয়া' লেখা হতে লাগল। ভারতীয় ভাষায় এ ধরণের প্রথম 'মার্শিয়া' লেখেন আহমদনগরের কবি আস্‌রফ 'নওশরহার' নামে, ষোল শতকের গোড়ায়। এর পরে গোলকুণ্ডার বিখ্যাত কবি ওয়াজহীর 'মার্শিয়া' জনপ্রিয় হয়। তারপর থেকে দাকিনীতে 'মার্শিয়া' কাব্য সাহিত্যের প্রধান শাখা হয়ে দাঁড়ায় সতেরো শতকের মাঝামাঝি।

সাফাভি ইরানের অনুপ্রেরণায় শিয়া উপকথাগুলিও 'দাকিনী'তে সমাদৃত ও অনুদিত হতে থাকে। হুসামুদ্দিনের (১৫ শতক) লেখা আলীর বীরত্বকাহিনীর একটি ফার্সি মস্‌নবীর দাকিনী কাব্যে প্রথম তর্জমা করেন বীজাপুরের কবি রুস্তমী, মুহম্মদ আদিল শাহের বেগম খুদেজা সুলতানের আদেশে ১৬৫০ সালে; এরই কিছু পূর্বে কারবালার ঘটনা নিয়ে 'মুসিবতে আহলে বায়্‌ত্‌' নামে মসনবি রচনা করেন গোলকুণ্ডার কবি আহমদ (৩০)। ষোল শতকের গোড়ায় লেখা বিখ্যাত শিয়া সাহিত্যিক হুসেন ওয়ায়েজ কাশিফীর মস্‌নবী 'রওজাতুম্‌-সুহাদা'র প্রথম বাঙলা তর্জমা করেন চট্টগ্রামের হামিদুল্লা খান উনিশ শতকে, কিন্তু 'দাকিনী' পদ্যে সতেরো শতকে এর প্রথম অনুবাদ করেন বীজাপুরের কবি সেওয়া। হানিফার উপাখ্যান নিয়ে আরও দুটি মহাকাব্যজাতীয় রচনা 'দাকিনী'তে লিখিত হয় গোলকুণ্ডায়; সেওকের 'জঙ্গনামা' আর লতীফের 'জফরনামা' সতেরো শতকের শেষের দিকে লেখা (৩১)।

কারবালার ঘটনা, আলী ও হানিফার রোমান্স নিয়ে বাঙলায় কাব্যরচনা সতেরো শতক থেকেই বেশী হয়েছে দেখা যায়। মুর্শিদাবাদের দরবারের দৃষ্টান্তে বাঙলা দেশে শিয়া ধর্মাচরণের প্রসার হয় আঠারো শতকের মাঝামাঝি থেকে; তার আগে জন-সাধারণের মধ্যে শিয়া ধর্মানুষ্ঠান পালনের তেমন কোনও নজীর বাঙলায় পাওয়া যায় না।

এনামুল হক বাঙলা সাহিত্যের এ ধারাকে মোগল সাংস্কৃতির প্রভাব বলেছেন। উত্তর ভারতের সাহিত্যে কিন্তু শিয়া বিষয়বস্তু বা ধর্মানুভাব সম্পর্কিত কোন রচনা আঠারো শতকের পূর্বে তেমন নাই। অথচ, দাক্ষিণাত্যের শিয়া মুসলিম রাজ্যগুলিতে ষোল শতক থেকেই এ জাতীয় সাহিত্যচর্চার প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে। সমুদ্রপথে বাঙলার সঙ্গে ইরান ও আরবের সাক্ষাৎ যোগ নিশ্চয়ই ছিল। কিন্তু সাংস্কৃতিক উপাদানের ক্ষেত্রে স্থল ও জল পথে গোলকুণ্ডা-বীজাপুর যে উত্তর ভারতের চাইতেও বাঙলার নিকটবর্তী ছিল, এই দুই অঞ্চলের সাহিত্য থেকে তার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। সে ইঙ্গিত অনুসরণকরে বাঙলা সাহিত্যের ঐতিহাসিকরা তার সত্যাসত্য যাচাই করতে চেষ্টা করবেন, এ আশা পোষণ করা বোধহয় অন্যায় হবে না।

প্রমাণপঞ্জী

(১) History and Culture of the Indian People, ed. Majumdar and Pusalkar, Bombay 1956, Vol V, p. 377.

(২) জীন বিজয় মুনি ও হরিবল্লভ ভায়ানি কর্তৃক সম্পাদিত, বোম্বাই, ১৯৫৪ খৃঃ। (সিংহী জৈন গ্রন্থমালা)

(৩) Indian Historical Quarterly, 1938, p. 175, no. 70.

(৪) ঐ নং ৭২।

(৫) এনামুল হক : মুসলিম বাঙলা সাহিত্য, ঢাকা ১৯৫৭, পৃ ২৩০।

(৬) Indian Historical Quarterly, ibid, no 67-69.

(৭) Keay, F. E. : Hindi Literature, Calcutta, 1933. p. 81.

দীনেশচন্দ্র সেন : বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, Descriptive Catalogue of Bengali Works, by J. Long (1855), পৃ: ৭০০।

(৮) নসিরউদ্দিন হাশমী : দাকিন্ মে উর্দু, লাহোর, ১৯৫২ ; পৃ: ৭৮।

(৯) Nichelson : Literary History of the Arabs, Cambridge, 1951, p. 459. ঢাকা ইউনিভার্সিটি লাইব্রেরীতে এর কয়েকটি খণ্ড আছে।

(১০) Ethe : Catalogue of Persian Mss. in the Bodlian Library, p. 422. Ousley no. 379, 380, 381.

(১১) Legacy of Persia, p. 203

(১২) সুকুমার সেন : ইসলামি বাঙলা সাহিত্য, বর্ধমান, ১৩৫৮, পৃঃ ২৩৪ ;
এনামুল হক : ঐ পৃঃ ২১৪, ২৮৩—২৮৬।

(১৩) রামবাবু সাকসিনা : উর্দু আদব কি তারিখ, ২য় খণ্ড, পৃঃ ১২ ;
Grundriessder Iranische Philologie, Strasbourg, 1896-1904, vol II : Neupersische Literatur, p. 322.

(১৪) Pertsch : Persischen Handschriften der Koeniglich Universi itat der Berlin, p. 997.

(১৫) ঐ

(১৬) আবদুল ওয়াহিদ : কারওয়ানে-আদাব পৃঃ ১১৪।

(১৭) Ivanow : Catalogue of Persian Manuscripts in the Asiatic Society of Bengal, Supp. I, p. 18, no. 779.

(১৮) এনামুল হক : ঐ।

(১৯) George A. Kuhn., ed. : Grundriessder Iranische Philologie, vol. II p. 322 ; Sprenger : Catalogue of Persian and Hindusthani Boo in the Library of the King of Oudh. 1865, vol I, p. 634.

(২০) Garcin de Tassy : Histoure de Literature Hindui., vol I, p. 393. vol. II, p. 468-470 ; Journal Asiatique 1835 pp 193-196, 338-68.

(২১) সৈয়দ আহমদ : ফারহাঙ্গে আসফিয়া, লাহোর, ১৯০১, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ৫৪-৫৫।

(২২) নসিরউদ্দিন হাশমী : ঐ পৃঃ ৭৮-৭৯।

(২৩) নসিরউদ্দিন হাশমী : ঐ, পৃঃ ৭৮-৮০।

(২৪) এনামুল হক—(মুসলিম বাঙলা সাহিত্য, পৃঃ ২৪৮) দোনা গাজী কৃত আর একটি সায়ফুলমুলুক-বদিউজ্জামালের উল্লেখ করেছেন যার তারিখ ১৫ শতকে পড়ে (ঐ পৃঃ ৮৫)। এ তারিখের কোনও প্রমাণ দেন নাই ; ফার্সি মূল পদ্য কাহিনী থেকে দোনা গাজী তাঁর কাব্য রচন করতে পারেন না, এমন নয়, তবুও এর তারিখ আরও প্রমাণনির্ভর।

(২৫) Grundriess der Iranische Philologie p. 321
নসিরউদ্দিন হাশমী : ঐ পৃঃ ১৬১—৬২।

(২৬) Yusuf Husain ed. Selected Waqai of the Deccan, Hyderabad, 19 p. 3 and 7.

(২৭) ফিহরিস্তে কুতুবখানা আসফিয়া, ৪র্থ খণ্ড, পৃ ৫৮৬।

(২৮) Ivanow : Catalogue of Persian Mss. in the Asiatic Society of Bengal p. 141, no. 330, and p. 142 no. 332.

(২৯) Browne, E. G. : Literary History of Persia, vol. IV p. 172-177

(৩০) নসিরউদ্দিন হাশমী : ইয়োরোপ মেঁ দাকিনী মখতুতাত পৃঃ ৭৫-৭৯।

(৩১) ঐ : দাকিন মে উর্দু, পৃঃ ১৪১-১৭৫ ; সামসুল্লাহ কাদরী—উর্দু-এ-কাদিম, পৃ ৬৪